বিজয় দিবস ২০০৭-এর বিশেষ রচনা

সৌজন্যেঃ

সমকাল

আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেও জরুরি -সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তার প্রমাণ ও লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়া। বিজয়ের পেছনে এটি একটি কালো ছায়া, পরাজয়ের চিহ্ন। যুদ্ধাপরাধীরা দুটি উপাদানে গঠিত। একটি পাকিস্তানি হানাদার; অপরটি তাদের স্থানীয় দোসর, দালাল, রাজাকার ও আলবদর। হানাদাররা চলে গেছে স্বদেশে, স্থানীয় দুর্বৃত্তরা দেশেই আছে, বড় বড় চাঁই যারা তারা প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে নিজেদের, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে তো অবশ্যই এমনকি রাজনীতিতেও। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া খুবই জরুরি ছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের প্রয়োজনে নয়, ন্যায়বিচারের অনুরোধে। প্রতিহিংসা উচ্চগুণ নয়, প্রতিহিংসাপরায়ণরা তাদের ক্ষতগুলোকে তাজা রাখে, শুকাতে না দিয়ে। তারা অতীতের জালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে জন্য এগুতে পারে না সামনের দিকে। এসব খুবই সত্য। যুদ্ধাপরাধীরা যে ক্ষতি করে গেছে আমাদের তা পূরণ হওয়া কঠিন, শাস্তি দিলে যে পূরণ হবে এমন নয়। শহীদদের তো আমরা আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। ব্যাপারটা ওই রকমের নয়, প্রতিহিংসার নয়, ব্যাপারটা বিচারেরই। বিচার প্রয়োজন একাধিক কারণে। দরকার ভবিষ্যতে যাতে '৭১-এর মতো ঘটনা আর না ঘটে তার ব্যবস্থা করার জন্য। দরকার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেও।

আরো একটা তাৎপর্য আছে এই বিচার করতে না পারার। সেই তাৎপর্যটাও সামান্য নয়। বিজয়ের পর যে প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে বলা যায় প্রধান হয়ে উঠেছিল সেটা হলো বাংলাদেশে নতুন যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার চেহারা কী হবে, কোন ধরনের রাষ্ট্র আমরা পেতে যাচ্ছি, ওই রাষ্ট্র কি পুরনো পাকিস্তানের মতোই একটি অমানবিক রাষ্ট্র হবে, নাকি তার চরিত্র হবে ভিন্ন ধরনের? ওই চরিত্র নিরূপণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের উদাসীনতা একটি দিকনির্দেশনা দিয়েছে বৈকি। অত বড় অপরাধের যখন বিচার হলো না, এ ক্ষেত্রেই যখন ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেল না, তখন অন্য অপরাধের বিচার হবে– এ আশাটা আঘাতপ্রাপ্ত হলো। জঘন্যতম অপরাধীরা যদি পার পেয়ে যায় তাহলে আইন-আদালত কেন, কেন বিচার ব্যবস্থার ওই বিপুল আয়োজন, অমন সব আড়ম্বর? অপরাধের শাস্তি হবে না ওই বোধটা অপরাধ নিবারণে কখনোই সাহায্য করে না, করতে পারে না। প্রশ্নটা স্পষ্টভাবে তোলা হয়নি, বিক্ষিপ্তভাবে তোলা হলেও নানা কোলাহলের মধ্যে শ্রবণগোচর হয়নি; কিন্তু প্রশ্নটা নীরব জিজ্ঞাসার মতো ছিল বৈকি। মানুষ সম্পর্কে অনেক উচ্চ প্রশংসা শোনা যায়, সে প্রশংসা যে অযৌক্তিক তা নয়, কিন্তু মানুষ যে কেমন ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার তুলনায় হিংস্রতম পশুদেরও যে ক্ষেত্রবিশেষে মানবিক মনে হয় তার প্রমাণ তো '৭১-এ আমরা পেয়েছি। দুর্ভোগের কাহিনী আমরা বলি, বলতে ভালোবাসি; শোক, আক্ষেপ ইত্যাদিতে বাষ্পাচ্ছন্ন রাখি নিজেদের বাক্য ও চেতনাকে, কিন্তু '৭১-এর ঘাতকদের ওই নৃশংসতাকে বিচারের মানবিক কাঠগড়ায় তো আমরা দাঁড় করাতে পারলাম না।

নতুন রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার প্রথম পরাজয় ঘটেছে যুদ্ধাপরাধীদের অভিযুক্ত না করার মধ্য দিয়ে। সব অপরাধীর বিচার যে সম্ভব ছিল না তা মানতেই হবে, কিন্তু বড় অপরাধীদের বিচার হওয়া তো দরকার ছিল। শিষ্টের লালনের জন্য দুষ্টের শাস্তি বিধান অত্যাবশ্যকীয়। ওই যে আমাদের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যর্থতা সেখান থেকেই বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যর্থতার শুরু। আজ যে দেশের বিচার ব্যবস্থায় মানুষের ন্যূনতম আস্থা নেই তার একটা ইতিহাস আছে বৈকি। বড় ঋণখেলাপিরা যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, ছোট ঋণ গ্রহণকারীরা জব্দ হয়– এই বাস্তবতা বহিরাগত যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া এবং অপরাধীদের দেশীয় অংশের পুনর্বাসনের ঘটনারই সমান্তরাল ব্যাপার; প্রথম ঘটনা দ্বারা প্রভাবিতও বটে। আমরা বলি জবাবদিহিতা নেই। কারোরই জবাবদিহিতা নেই। কোথাও নেই। আমলাতন্ত্রের তো নেই-ই, ব্যবসায়ীদেরও নেই। জনপ্রতিনিধিরা জবাবদিহিতার দায় কাঁধে নিয়েই নির্বাচিত হন– এ রকমের ভানও করেন; কিন্তু মোটেই দায়বদ্ধ থাকেন না। জবাবদিহিতা না থাকার প্রতিও সমর্থন আমাদের ওই অত্যন্ত বড় ব্যর্থতার মধ্যেই রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের নৃশংসতম অপরাধের ব্যাপারেই যখন জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা গেল না, তখন চোর ও পকেটমারের কাছ থেকে লোকে আর কতটা জবাবদিহিতা প্রত্যাশা করবে? মোটেই প্রত্যাশা করে না, সে জন্য হয় উদাসীন থাকে, নয়তো সুযোগ পেলে তাদের প্রহার করে। আইন তুলে নেয় নিজের হাতে।

হানাদার ও তাদের দোসররা যুদ্ধাপরাধ করেছে এটা বললে সবটা বলা হয় না, বলতে হবে তারা গণহত্যা ঘটিয়েছে। এই বঙ্গভূমিতে গণহত্যা আরো একবার ঘটেছিল। ১৯৪৩ সালে, যাকে আমরা '৫০-এর মন্বন্তর বলি। সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কম করে হলেও ৩০ লাখ গরিব মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সেটাও আসলে গণহত্যাই, ইংরেজ শাসকরা ঘটিয়েছে। ওই গণহত্যারও বিচার হয়নি। '৭১-এর গণহত্যারও বিচার হলো না। '৪৩-এর যদি বিচার হতো তাহলে '৭১ ঘটত না, কেননা বিচার হলে অভিযুক্ত শাসকরাই যে প্রধান শত্রু এই সত্যটা উন্মোচিত হয়ে যেত, সেই শত্রুর মোকাবেলা করতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হতো। ঐক্যবদ্ধ হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না করে তারা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করত, বাংলা ভাগ হতো না এবং বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ না হলে '৭১-এর দ্বিতীয় গণহত্যাও ঘটত না। '৭১-এর শত্রু খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। হানাদাররা যে কেবল অস্ত্রধারী ছিল তা নয়, তারা একটি আদর্শেরও বাহক ছিল বৈকি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যেমন ছিল সশস্ত্র, তেমনি ছিল আদর্শিক। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরতে হয়েছে, আদর্শের বিরুদ্ধে আদর্শ। হানাদারদের ছিল ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ, আমাদের ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তারা ছিল স্বৈরাচারী, আমরা গণতান্ত্রিক। ওরা করছিল আক্রমণ, আমরা করছিলাম প্রতিরোধ। যুদ্ধ শেষে ওই হানাদার

ও তাদের স্থানীয় দোসররা যে আমাদের মিত্র হয়ে গিয়েছিল তা তো নয়। তারা শত্রুই ছিল। যে আদর্শ এবং ব্যবস্থা রক্ষার জন্য তারা লড়ছিল সেই আদর্শ এবং ব্যবস্থা তারা ফেলে রেখে গিয়েছিল; আমাদের পক্ষে কর্তব্য ছিল ওই দুটিকে বিদায় করে দেওয়া। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারটা কিন্তু ওই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আদর্শিক চিন্তার সঙ্গেও যুক্ত। ব্যবস্থা ও আদর্শ এক ধরনের মূর্তি পেয়েছিল তাদের রক্ষাকারী ওই দুর্বৃত্তদের মধ্যে। তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারলে আমরা আমাদের আদর্শিক বিজয়কে দৃঢ় করতে পারতাম; কিন্তু সে কাজটা করা হয়নি। যুদ্ধে আমরা যে জিতেছি তার প্রমাণ কী? প্রমাণ কি এই নয় যে, তাদের রেখে-যাওয়া ব্যবস্থার পুরনো জুতো ও আদর্শের পুরনো কাপড় আমরা মহোৎসাহে পরিধান করছি? অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে আমরা তো পরিধানের ওই আগ্রহটাকেই উৎসাহিত করলাম। বিজয়ের পর প্রধান শত্রু ছিল পুরনো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং তাদের অগণতান্ত্রিক আদর্শ; শত্রু ছিল ওই দুই বস্তুর ধারক ও বাহকরা। কিন্তু ধারক-বাহক হানাদারদের আমরা চলে যেতে দিয়েছি। প্রতীক হিসেবে কয়েকজনকে যে আটকে রাখব তাও পারিনি। আর রাজকারদের তো রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমাই করে দেওয়া হলো। নতুন রাষ্ট্রের যারা কর্তৃপক্ষ, যারা নেতা তারা যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান শত্রু মনে না করে বামপন্থিদেরই প্রধান শত্রু মনে করলেন। বললেন, উগ্র বামপন্থিদের দেখামাত্রই গুলি করা হবে। শাসনকর্তাদের প্রধান শত্রু যে বামপন্থিরা ছিল না, ছিল যে পাকিস্তানপন্থিরাই সেটা অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রমাণিত হলো '৭৫-এর নৃশংস ও অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। বামপন্থিদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল, কিন্তু তাদের মূলধারা যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার জন্য লড়ছিল তাতে তো কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

২. পেছনে ফিরে তাকালে এটা অবিশ্বাস্যই মনে হবে যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি। হানাদাররা ফিরে গেছে, ফিরে গিয়ে বই লিখছে, সাক্ষাৎকার দিচ্ছে, যেন যুদ্ধ করছে শুধু, গণহত্যা করেনি। হানাদারদের প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো মৃত্যুর আগে ঢাকা ঘুরে গেছে এবং দালালরা তাকে জিন্দাবাদও দিয়েছে। আর যে দেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষ পুনর্বাসিত হয়নি, যোদ্ধাদের অনেকে ভিক্ষা করে, সেখানে রাজাকাররা বহাল তবিয়তেই রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে রাজাকাররা এখন গুরুত্বপূর্ণ, বেশ শক্তি রাখে। এটা লজ্জার ব্যাপার তো অবশ্যই। নিজেদের কাছে, বিদেশিদের কাছেও। '৭১-এর ওই হত্যাকাণ্ড যার কথা আমরা হামেশা বলি, সংখ্যা দেই, বলি অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা। ওই ক্ষতি ও দুর্ভোগে দুঃখ প্রকাশের ব্যাপারে আমরা কতটা আন্তরিক এবং যুদ্ধও যে আমাদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে প্রশ্নটা করার জন্য দোষ দেব কাকে? সন্দেহ হবে নাকি, আমরা বাড়িয়ে বলেছি? নইলে অপরাধীদের বিচার হলো না কেন? নাকি বলতে থাকব, আমরা এত উদার যে, হত্যা ও ধর্ষণকে কোনো অপরাধ বলেই মনে করি না। আজো অবশ্য করছি না, আজো উদারই রয়েছি। এ উদারতারও সূত্রপাত কিন্তু অপরাধীদের বিচার না করার ঘটনার মধ্য থেকেই। হানাদাররা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল; কেবল তা-ই নয়, আত্মসমর্পণের সময়ে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানী উপস্থিত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত রইলেন না। কেন আসতে পারলেন না, তারও কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না এবং আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সবটাই ভারতের মধ্য দিয়ে নিজেদের দেশ পাকিস্তানে ফেরত চলে গেছে। যেন আমরা কেউ নই, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়াটা তাই মোটেই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি মূল ঘটনারই প্রকাশ। মূল ঘটনা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম সে ক্ষেত্রে আমাদের মর্মান্তিক ব্যর্থতা। আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতা।

৩. রাষ্ট্রীয়ভাবে না পারা যাক, সামাজিকভাবে তো পারা যেত রাজাকারদের একঘরে করা। সেটা কেন করা গেল না? এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে এবং থাকবে। আমরা সমাজকে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় বলে ভাবি, তা সে বড় বটেই; কিন্তু রাষ্ট্র নিজের হাতে ক্ষমতা রাখে সমাজকে কেবল প্রভাবিত নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রিত করারও এবং সত্য এটাও যে, একাত্তরের বিজয়ের পর সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ববর্তী আদর্শই কার্যকর ছিল। সেটা গণতান্ত্রিক আদর্শ নয়। অর্থাৎ পারস্পরিক মৈত্রীর আদর্শ নয়, সেটা হলো পুঁজিবাদী আদর্শ। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তিটাই ছিল মৈত্রীতে; সব মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল, ভেদাভেদ ছিল না শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে। সেই মৈত্রী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তখন প্রত্যেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেরটা নিয়ে। আদর্শিকভাবে এও একটা বিরাট পরাজয়। এর দরুন ঐক্য রইল না এবং সমাজে যদি ঐক্য না থাকে, মানুষ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পরস্পর থেকে তাহলে কে বিচার করে কার, বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যেগুলো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নয়, আসলেই জাতীয়। সেভাবে বিচার করা সম্ভব হওয়ার কথা নয়, সম্ভবও হয়নি। রাষ্ট্র থেকে নির্দেশ পাওয়া যায়নি, কোনো পরামর্শও দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রে যারা ক্ষমতায় ছিলেন স্থানীয়ভাবেও তারাই ছিলেন প্রধান শক্তি, তারা ব্যস্ত ছিলেন অন্য কাজে। রাজাকারের, বিশেষ করে ওজনদার রাজাকারের সন্ধান পেলে তাদের খুব সুবিধা ছিল, শাস্তি দেওয়ার দিক থেকে নয়, শাস্তিদানের ভীতিকে জাগিয়ে রেখে টাকা-পয়সা সংগ্রহের দিক থেকে। রাষ্ট্র কোনদিকে যাবে সেও বোঝা যাচ্ছিল। এতদিন আমরা কষ্ট করেছি এখন ভোগ করব, এটাই হয়েছিল মূল দর্শন। একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো, রাজাকারদের তালিকা তৈরি না করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি করা। একদিক থেকে এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ছিল। কেননা মুষ্টিমেয় দালাল ও রাজাকার ভিন্ন দেশের সব মানুষই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, তাই রাজাকারদের তালিকা প্রস্তুত করলেই মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা পাওয়া যেত, কষ্ট করতে হতো না। সরকারের দিক থেকে আবার এটা প্রয়োজনীয় ছিল। সেটা এই কারণে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়া আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। স্মরণীয়, মুক্তিযুদ্ধে মানুষ এই আশায় যায়নি যে, দেশ যখন স্বাধীন হবে, ব্যক্তিগতভাবে তখন তারা লাভবান হবে, পুরস্কৃত হবে। যুদ্ধে গেছে শত্রুকে হারাবে বলে। যুদ্ধ শেষে যেহেতু উপরের মানুষরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে, তাই তারা ভেবে দেখলেন নিচের মানুষদেরও কিছু না কিছু দেওয়া চাই, আর কিছু যদি দিতে না পারাই যায়, তবে অন্তত একটা সার্টিফিকেট দেওয়া যাক হাতে ধরিয়ে। ঘুষ দেওয়া হলো। কাউকে কাউকে দেওয়া হলো লুটপাটের সুযোগ, কেউ পেল চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা; সে বছর দেশে পড়াশোনার কোনো অবস্থাই ছিল না, ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হলো ছেলেমেয়েদের। মুক্তিযুদ্ধে শারীরিকভাবে যারা অনুপস্থিত ছিলেন, তারাই সুবিধা পেলেন বেশি। তারা ভাবলেন, তালিকাভুক্ত করে এবং পুরস্কারের আশা নিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের শান্ত রাখা যাবে। এই ডামাডোলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নটা বেমালুম হারিয়ে গেল।

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বলেছিলেন এই রকম যে, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র; কিছুদিন পর তিনি লাহোরে গেছেন মুসলিম প্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে। এই দুটি ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের নয়, বরং বিপরীত পথে অগ্রযাত্রার ইশারাই তুলে ধরল। বোঝা গেল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তো সুদূরপরাহত বটেই, ধর্মনিরপেক্ষতা কতটা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়েও সন্দেহ। এই যে সূত্রপাত সেটা থেমে থাকেনি, অধঃপতনের পথে রাষ্ট্র ও সমাজকে সে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারটা একটি অপরাধবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, একেবারে প্রথমেই। যে জন্য বারবার বলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীনতা নয়। ভারতে যেমনটা ইতিপূর্বেই ঘটেছে, বাংলাদেশেও তা নতুন করে ঘটা শুরু হলো। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ দাঁড়াল সব ধর্মকে সমানে উৎসাহিত করা। ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই

এবং রাষ্ট্র চাইবে দেশে একদিকে অসাম্প্রদায়িকতা, অন্যদিকে দার্শনিক ও আদর্শিকভাবে ইহজাগতিকতার চর্চা চলবে, এটা ঘটল না। তারপর মধ্য আগস্টের সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তো রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উৎখাতের অঙ্গীকারই ব্যক্ত করা হলো, একেবারে সাংবিধানিকভাবেই। এরশাদ সাহেব এসে আরো এগিয়েছেন, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। সেভাবেই আছে। অন্য ধারার সংশোধন এসেছে, কিন্তু আদি সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তাকে ফেরত আনার কোনো চেষ্টা হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কি-না এরও সদুত্তর পাওয়া মুশকিল।
৪. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তা হলে কি কোনো দিনই হবে না? হ্যাঁ, হবে এবং হতেই হবে। হবে তখনই যখন যে আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই আদর্শে বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে। আদর্শটা ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার, সে রাষ্ট্র ও সমাজ অবশ্যই হবে ধর্মনিরপেক্ষ, ইহজাগতিক এবং সমতাভিত্তিক এ দেশের শ্রমজীবী মানুষ এ ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজই চায়, এর জন্যই তারা যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করছে। শ্রমজীবী মানুষ যেদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে সেদিন রাষ্ট্রের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন আসবে। রাষ্ট্র তখন হানাদারদের বিচারের দাবিটিকে বিশ্ব আদালতে নিয়ে যাবে। প্রধান প্রধান রাজাকারেরও বিচার হবে এই দেশের মাটিতেই। সর্বোপরি বাংলাদেশে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যে সমাজের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রতিনিয়ত অভিযুক্ত করবে ওই যুদ্ধাপরাধীদের, আদর্শিকভাবে ধিক্কার দেবে হানাদার ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের। বাংলাদেশ যত এগুবে ওরা তত নামবে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ তো কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছাবে না যদি তারা সংগঠিত না হয়, বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে না তোলে এবং আন্দোলনের পথে না নামে। মুক্তিযুদ্ধ আসলেই শেষ হয়নি।

লেখক : শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক

[মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভের বাংলা সেকশনের মেইন পেজ-এ যেতে এখানে ক্লিক করুন]